ঃ যোগাযোগ ঃ
প্রতাপ দীঘি লোক বিজ্ঞান সংস্থা, পূর্ব মেদিনীপুর, শোভনলাল সাহু -৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, সুমন চন্দ, মুর্শিদাবাদ-৯৬৭৪০৩১০৮২

বিশেষ সংখ্যা
বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ-৯৪৩৪৫৭০১৩০

বর্ষ-১৩ সংখ্যা - ৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০১৬ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২ টাকা

চকোলেট ও রসায়ন

সময়টা ১৫০২ সাল। চতুর্থবারের জন্য সমুদ্রযাত্রা শেষ করে কলম্বাসের নাবিকরা ইউরোপ ফিরে আসার সময় বিশেষ এক ধরণের ফল সাথে করে নিয়ে এলেন যা ইউরোপবাসী আগে কখনো দেখেনি। কোকোয়া বিন্স। গেঁজে যাওয়া এই কোকোয়া বিন্স শুকিয়ে যে গাঢ় রঙের বিশেষ পদার্থ পাওয়া গেল তার সাথে চিনি, ভ্যানিলা, দুধ ও নানা রকম সুগন্ধি পদার্থ মিশিয়ে স্প্যানীয়রা তৈরী করলেন এক নতুন ধরণে পানীয়। যাকে আধুনিক চকোলেটের প্রাথমিক সংস্করণ বলা যেতে পারে। অ্যাজটেক সম্রাট মন্টেজুমা তো এই তরলের নাম দিয়েছিলেন 'ঐশ্বরিক পানীয়' কারণ এর প্রভাবে সহজেই কান্তি দূর হতো। এই কোকোয়া বিন্স থেকে তৈরী পানীয়র হদিস কিন্তু প্রাচীন মায়া সভ্যতাতেও পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ মায়ান লিপিতে এমন উল্লেখও লক্ষ্য করেছেন যে নিত্য পানীয় ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে এর ব্যবহার ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

তবে স্পেনীয়রা প্রথম চকোলেট তৈরী করার পরও কয়েক শতক ধরে চকোলেট কিন্তু কেবল পানীয় হিসাবেই গ্রহণ করা হত। প্রথম কঠিন চকোলেটের হদিস পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে, যেখানে

এরপর 5 পাতায়

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

(১৮৯৪-১৯৭৪)

এ এমন এক মানুষের কথা যাঁর পরামর্শক্রমে প্রখ্যাত ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিপুলায়তন গ্রন্থ 'The Origin and Devlopment of Bengali Language' ছাপানোর পূর্বে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেন। এ এমন এক মানুষের কথা, অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে গ্রন্থটি লেখার সময়ে যাঁর সদুপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করেন। এ এমন এক উদাসীন বাঙালীর কথা যাঁর নামে চিহ্নিত হয়েছে বিশ্বের তাবৎ মৌলিক কণার বৃহদাংশ, যাঁর মূল কাজের উপর নির্ভর করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন একাধিক বিজ্ঞানী অথচ তাঁর নিজেরই প্রথাগত পি এইচ ডি করে ওঠা হয়নি। সামান্য এফ আর এস হতে লেগে গেছে জীবনের চৌষট্টিটা বছর।

PADMA VIBHUSHAN
Satyendra Nath Bose
India's Great Physicist
1 January 1894 - 4 February 1974

১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ খ্যাতির মধ্য গগনে থাকা বিশ্বকবি পৌঁছেছেন জার্মানী। সাক্ষাৎ নির্দিষ্ট হয়েছে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের সাথে। দেখা হতে প্রাথমিক কুশল বিনময়ের পরে বিজ্ঞানী কবির কাছে জানতে চেয়েছেন বোস এর খবরাখবর। রবীন্দ্রনাথ হতবাক। কে এই 'বোস'। এক শহরে বাস করেও তিনি যাঁকে চেনেন না, আর দূর দেশের বিশ্ববন্দিত মহান বিজ্ঞানী তাঁর সংবাদ পেতে ইচ্ছে করেন!

হ্যাঁ, আমরা আলোচনা করছি শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বোস এর কথা; সংক্ষেপে অধ্যাপক এস এন বোস। বহুগুনের অধিকারী এই মানুষটির জন্ম হয়েছিল উত্তর কোলকাতার গোয়াবাগানে, ১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী। পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু এবং মাতা আমোদিনী দেবী। বাবা ছিলেন গ্রেট ইষ্টার্ন রেলের হিসাবরক্ষক। পাঁচ বছর বয়সে সত্যেনকে ভর্তি করা হয় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ধন্য নর্মাল স্কুলে। এরপর বাড়ির কাছে নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলে পড়াশোনা চলতে থাকে। একেবারে ছোটবেলা থেকে সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারনত্ব প্রকাশ পেতে শুরু করে। শিশু সত্যেনকে তার বাবা চক দিয়ে ঘরের মেঝেয় কিছু অঙ্কের প্রশ্ন

এরপর 2 পাতায়

আমরা যা খাই
ঢেড়শ / রোমশ

নামান্তরে ঃ অসমীয়া, ওড়িয়া-ভেন্ডা, বাংলা- ঢেড়শ, হিন্দী, পঞ্জাবী-ভিন্ডি, গুজরাতি-ভিন্ডা, কন্নড়- ভেন্ডেকায়ী, মালয়ালম তামিল - ভেন্ডাক্কা, মারাঠী- ভেন্ডা, ভেলুগু-ভেন্ডা সংস্কৃত-রোমশ, গন্ধ মূলা, ইংরাজী Ladies figer

উৎপত্তি ও বিস্তার ঃ আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ইথিওপিয়াতে নাকি ঢেড়শ নামক এই সব্জিটির জন্ম। মিশর, জর্ডন লেবালন, তুরস্ক, ইরান ও ইয়েমেন এর লোকেরা আজও ঢেড়শকে মাংসের সঙ্গে রান্না করেই যায়।

এখন ভারত এবং তার আশপাশের দেশগুলিতে এর ব্যাপক চাষ করা হয়ে থাকে।

পরিচিতি ঃ একটি খাড়া বিরুৎ জাতীয় বর্ষজীবী রোমশ ক্ষুপ সাধারণত ২-৩ ফুট উঁচু হয়ে থাকে। পাতা ও কান্ড খসখসে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমযুক্ত। পাতা করতলাকার ৩-৫ ভাগে বিভক্ত, অনিয়মিত ভাবে দন্তুর। পাতার বোঁটা ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত রোমযুক্ত। ফুল কাক্ষিক, একক ভাবে ফোঁটে, হলুদ রঙের মাঝ খানটা লালচে বেগুনী।

ফল - ৬-১০ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা, ঝলন্ত ক্যাপসুল তার আগার দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে আসা। ৬-৮টি শিরাযুক্ত বীজ গোলাকার ধুসর বর্ণের দাগযুক্ত।

এরপর 6 পাতায়

জাতীয় অধ্যাপক

1 পাতার পর

দিয়ে যেতেন। আর সমস্ত মেঝে জুড়ে তার সমাধান করে চলত সে।

বালক সত্যেনের স্মৃতি শক্তি ছিল অতুলনীয়। পাঠ্য বইয়ের যে পাতাগুলি তার পড়া হয়ে যেত, অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে দিত সে। পরবর্তীকালে মা বাবার প্রশ্নের উত্তরে সে জানাত যে ঐ পাতাগুলি তার পড়া হয়ে গেছে এবং বাস্তবিকই সেই পড়া সে মনে করতে পারত অবিকল।

সাত সন্তানের মধ্যে একমাত্র পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি তার বাবার ছিল বিশেষ নজর। ভাল পড়াশুনার জন্যে তাকে ভর্তি করা হল হিন্দু স্কুলে। বিশিষ্ট শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনো চলতে লাগল। টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' কিংবা কালিদাসের 'মেঘদূত' ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। হিন্দু স্কুলে এন্ট্রান্স এর টেস্ট পরীক্ষা। শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বক্সির কাছে অঙ্কে ১০০র মধ্যে ১১০ পেল সত্যেন। অন্যান্য শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তরে উপেন্দ্রনাথবাবু বলেছিলেন যে, মোট ১১টি প্রশ্নের মধ্যে ১০টির উত্তর করতে হত, সত্যেন শুধু যে ১১টি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়েছে তাই নয়, জ্যামিতির একস্টাগুলির সমাধান বিভিন্ন ভাবে করে দেখিয়েছে। কিন্তু এন্ট্রান্স দেওয়া হল না সত্যেনের। পরীক্ষার ঠিক দু'দিন আগে চিকেনপক্স হওয়াতে সে পরীক্ষায় বসতে পারল না। ১৯০৯ সালে অর্থাৎ পরের বছর পঞ্চম স্থান লাভ করে এন্ট্রান্স পাস করল সে। ভর্তি হল প্রেসিডেন্সি কলেজে। এরপরে আর কোন পরীক্ষাতেই সে প্রথম ব্যতীত অন্য কোন স্থান লাভ করেনি। ১৯১৩ সালে গর্ণিত অনার্স বিষয়ে বি এস সি পরীক্ষার ফল বেরুল। প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় মেঘনাদ। ১৯১৫ সালে এম এস সি পরীক্ষা সম্পূর্ণ হল। মিশ্র গণিত বিভাগে প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ এবং ফলিত বিভাগে প্রথম মেঘনাদ।

সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ যেন এক চাঁদের হাট। শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদীশ চন্দ্র বোস, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ডি এন মল্লিক, শ্যামাদাস মুখার্জ্জী, সি ই কালিস, মনমোহন ঘোষ, মি. পার্শিভাল, পি সি ঘোষ প্রমুখ দিকপাল ব্যক্তিরা। আর ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী, নিখিলরঞ্জন সেন, পুলিন বিহারী সরকার, মানিকলাল দে, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং উজ্জ্বলতম নক্ষত্র সত্যেন্দ্রনাথ বোস। পি সি মহালা নবিশ, নীলরতন ধর ও এস কে মিত্র এই দলের থেকে কয়েক বছরের বড়। আর সুভাষ বোস সামান্য ছোট। এই মানুষগুলির উপরেই নির্ভর করছে আগামী দিনে ভারতবর্ষের গতিপ্রকৃতি।

বঙ্গভঙ্গ, বয়কট, স্বদেশী একের পর এক ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন আছড়ে পড়ছে চারপাশে। এর ছোঁয়া লাগছে সত্যেন ও তার সহপাঠীদের জীবনে। রাতের স্কুলে কাস নিতে যাচ্ছে সত্যেন। সহপাঠীদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করছে সে। দুর্বল চোখের জন্য খেলাধূলার প্রতি মনোযোগ দেখাতে পারেনি কোন দিন। তবু চশমা চোখে এই বিস্ময় যুবকের বন্ধু বাৎসল্য তাকে করে তুলেছে নয়নের মনি।

ইতি মধ্যে ১৯১৪ সালে ডা. যোগিন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র কন্যা উষাবতীর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে সত্যেনের। বাবা-মা এর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে দুটি শর্ত দিয়েছিল সত্যেন। প্রথমত বিবাহে কোনরূপ পন নেওয়া যাবে না এবং দ্বিতীয়ত তার নৈতিক চরিত্রের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি টের পাওয়া যায় তার বন্ধু বান্ধব পরিচিতি।

১৯১৪ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তৈরি করেছেন ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স। সেখানে পদার্থ বিদ্যা পড়ানোর ডাক পেলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা। কিন্তু সেখানে আধুনিক বই, ম্যাগাজিন কিংবা ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতির বড় অভাব। সেই সময়ে শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ড. ব্রুলের কাছে হদিস পাওয়া গেল সাম্প্রতিক বইপত্রের। কিন্তু তার ভাষা জার্মান। স্বল্প সময়ে জার্মান ভাষা আয়ত্ত করে ফেললেন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি ও মেঘনাদ মিলে স্থির করলেন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ইংরেজি অনুবাদ করবেন। আইনস্টাইনের অনুমতি সাপেক্ষে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ পেল সেই অনুবাদ গ্রন্থ। ১৯১৮ সালে লন্ডনের 'Philosophical Magazine' থেকে মেঘনাদের সাথে যৌথ ভাবে প্রকাশ পেল সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম গবেষণাপত্র 'The Influence of the Finite Volume of Molecules on the Equation of State', ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে ;Bulletin of the Calcutta Mathmatical Society' থেকে প্রকাশ পেল অঙ্কের জটিল সমস্যাঘটিত দুটি গবেষণাপত্র। ১৯২০ সালে লন্ডনের Philosophical Magazine থেকে প্রকাশ পেল "The deducation of Rydberg's Law from the Quantum Theroy of Spectral Emission" শীর্ষক গবেষণাপত্র। এই গবেষণাপত্রগুলি সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতাকে প্রমাণ করল। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যা বিভাগের পুরানো পাঠ্যসূচীর পরিমার্জন করে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ আধুনিক পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় তার অর্ন্তভুক্ত করলেন।

১৯১৯ সালে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি নিয়ে মেঘনাদ ইউরোপ যাত্রা করলেন। এদিকে আশুতোষের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের সম্পর্ক কিছুটা শীতল। আশুতোষ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপক রূপে তুলে এনেছেন পদার্থবিদ্যার আর এক নক্ষত্র সি ভি রমনকে। এমন সময়ে ১৯২১ সালে কাজ শুরু করল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তার উপাচার্য ড. ফিলিপ হার্টগ পদার্থবিদ্যা বিভাগের দায়িত্ব নিতে ডাক পাঠালেন সত্যেন্দ্রনাথকে। খবর পেয়ে আশুতোষ সত্যেন্দ্রনাথকে অধিক বেতনের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু ঢাকায় পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন সত্যেন্দ্রনাথ, তিনি যোগ দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই প্রসঙ্গে ড. ডি এম বোসকে অনুসরণ করে বলা যায় ১৯২০ সাল নাগাদ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে একদিকে একাধিক উপযুক্ত শিক্ষকদের সমাহার এবং অপর দিকে তাদের উপযুক্ত গবেষণাগার ও যন্ত্রপাতির অভাবে উত্তাপ কিছুটা বৃদ্ধি পেল। তার ফলশ্রুতি হল একাধিক শিক্ষকের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিব্রাজন। আর সেই কাজ শুরু হল সত্যেন্দ্রনাথের ঢাকা গমনের মধ্য দিয়ে।

গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব থাকলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবউদ্যমে কর্ম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সত্যেন্দ্রনাথ। এমন সময়ে বিলাত ফেরত ডি এম বোস তাঁর হাতে তুলে দিলেন Max Planck এর লেখা 'Thermodynamik and Warme strahlung" এই বইতে প্ল্যাঙ্ক তাঁর কোয়ান্টাম তত্ত্বে বলেছেন যে কোন কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ জলের স্রোতের মত একটানা হয় না, এক্ষেত্রে ঝলকে ঝলকে শক্তির এক একটা প্যাকেট বেরিয়ে আসে। এই প্যাকেটগুলির নাম দেওয়া হয় ফোটন। প্ল্যাঙ্ক এই বিকিরনকে একটি সূত্রের আকারে প্রকাশ করেন। তীক্ষ্মধী সত্যেন্দ্রনাথ এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ফোটনকে ভরযুক্ত কনারূপে ধারনা করে নতুন ব্যাখ্যা ও পদ্ধতির মাধ্যমে প্ল্যাঙ্ক এর সমীকরণে পৌঁছান। তাঁর এই গবেষণাপত্রটি তিনি লন্ডনের ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন ও অন্যান্য কিছু পত্রপত্রিকায় পাঠালে তারা প্ল্যাঙ্ক এর ভ্রম সংশোধন রূপে এই তরুন গবেষককে

এরপর 3 পাতায়

জাতীয় অধ্যাপক

2 পাতার পর

মেনে নিতে না পেরে ছাপাতে অস্বীকার করল। ৪ঠা জুন ১৯২৪, দিশেহারা সত্যেন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন মহান বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে। অনুরোধ করলেন যে গবেষণাপত্রটি উপযুক্ত মনে হলে তিনি যেন সেটি ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন। তিনি লিখলেন যে 'আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এই অনুরোধ করতে আমি কোনরূপ দ্বিধা বোধ করছি না কারণ আপনার লেখা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে আপনি যে শিখা আমাদের দিয়েছেন তার জোরে আমরা সবাই আপনার ছাত্র'।

জহুরী চিনতে পারলেন এই মূল্যবান রত্নটিকে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্র 'Planck' Law and Light Quantum Hypothesis' প্রকাশ পেল জার্মান বৈজ্ঞানিক জার্নাল 'Zetischrist fur Physik' এ।

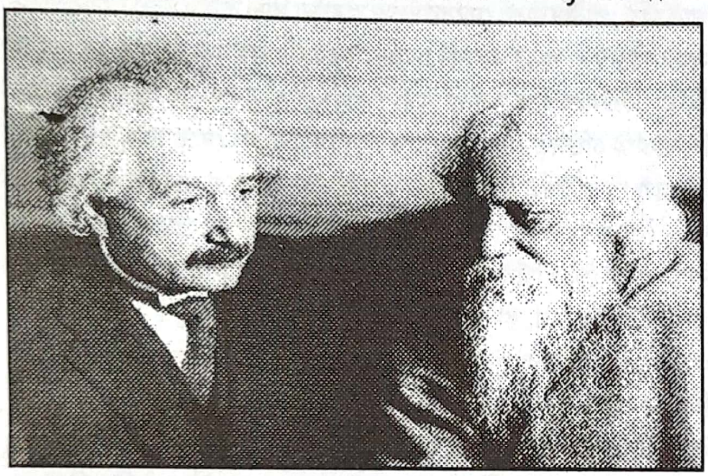

জহুরি চিনতে পারলেন এই মূল্যবান রত্নটিকে, সত্যেন্দ্রনাথের গবেষনাপত্র জার্মান বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশ পেল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে নিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র একটি নতুন সমীকরণ আবিষ্কার করেননি বরং পদার্থ বিদ্যায় যোগ করলেন একটি নতুন ধারণা, একক পরমাণু সম্পন্ন গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্ব। পৃথিবীর অর্ধেক মৌলিক কণা 'বোসন' নামে পরিচিত হল। যার শেষ তম কনাটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হল ২০১২ সালে সার্ন গবেষণাগারে। যার নাম 'ঈশ্বরকণা'। সেই মুহূর্তে অন্যেরা বুঝতে না পারলেও আইনস্টাইন বুঝেছিলেন এই তরুন গবেষকের ভাবনার গুরুত্ব। তিনি অবিলম্বে এই ধারনাকে প্রয়োগ করলেন আদর্শগ্যাসের ক্ষেত্রে এবং যে নতুন সম্পর্ক তিনি পেলেন তাই পরিচিত হল 'বোস-আইনস্টাইন' সংখ্যায়ন নামে।

১৯২৬ সালে দেশে ফিরে এলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ব্রতী থাকলেন নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানের পথে দীক্ষিত করার কাজে। ১৯৪৫ সালেই কোলকাতায় ফিরে যোগ দিলেন ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্সে।

আইনস্টাইনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল একক ক্ষেত্র তত্ত্ব। তিনি মহাকর্ষীয়, তড়িৎ চুম্বকীয় ও মৌল কণাসমূহের ক্ষেত্রেও ঐ তত্ত্ব প্রসারিত করেন। এর প্রথম ধাপে রয়েছে ৬৪টি সমীকরণ, যেগুলির সমাধান সেই সময়ে করা যাচ্ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ ১৯৫২ সালে সেই জটিল সমীকরণগুলিকে দুটি ভাগে যথাক্রমে ৪০টি ও ২৪টি করে ভাগ করে সহজেই সমাধান করেদিলেন। বিশ্ব বিস্মিত হল সত্যেন্দ্রনাথের কর্মকুশলতায়।

এছাড়াও পদার্থের চৌম্বকত্ব, বেতারতরঙ্গের বিস্তার, কেলাসের গঠন প্রণালী, স্ক্যানিং স্পেকট্রোফোটোমিটার আবিষ্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর তৈরী একটি রাসায়নিক আজও চোখের ওষুধ রূপে ব্যবহার হয়।

১৯৫১ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শাখা ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে পুনরায় গেলেন ইউরোপে। প্যারিস ও ইংল্যান্ড হয়ে দেশে ফিরলেন। ১৯৫২ সালে ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থার ডাকে আবার গেলেন ইউরোপ। হাইডেলবার্গে দেখা হল বিজ্ঞানী বো তে'র সাথে। দেখা হল পরমাণু বিভাজনে সফল নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী অটো হানের সাথে। সাক্ষাৎ হল বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গের সঙ্গে। ১৯৫৫ সালে আপেক্ষিকতাবাদের সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষ্যে,সত্যেন্দ্রনাথ গেলেন সুইজারল্যান্ডের বার্ণ শহরে।১৯৫৮ সালে পুনরায় লন্ডন যেতে হল রয়াল সোসাইটির আমন্ত্রণে। FRS উপাধিতে ভূষিত হলেন তিনি। ষাটের দশকে হিরোসিমা ও নাগাসাকি দিবস উপলক্ষ্যে যোগ দিলেন জাপানের 'বিজ্ঞান ও দর্শণ' সম্মেলনে। বিজ্ঞানচর্চায় জাপানি ভাষার ব্যবহার তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে।

আধুনিক পদার্থ বিদ্যার ভিত্তি নির্মাণে অসীম কৃতিত্বের অধিকারী সত্যেন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাননি, কিন্তু মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত । ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর একমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বিশ্বপরিচয় উৎসর্গ করেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সত্যেন্দ্রনাথকে সভাপতি নির্বাচিত করে। ১৯৫৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথকে ভারত সরকার 'পদ্ম বিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৫৯ সালে তাঁকে 'জাতীয় অধ্যাপক' রূপে সম্মানিত করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এই সম্মানের জয় টীকা আমৃত্যু তাঁকে গৌরাবান্বিত করে। পরবর্তীকালে ১৯৮৬ সালে পার্লামেন্টের আইন বলে ভারত সরকার কোলকাতা সল্টলেকে তাঁর নামাঙ্কিত 'সত্যন্দ্রনাথ বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা করে। জওহরলাল নেহেরুর ঐকান্তিক ইচ্ছায় ১৯৫২-১৯৫৮ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের রাজ্যসভার সদস্য। ১৯৫৬-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট' এর সভাপতি হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়ে তিনি রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীকে অনুসরণ করেছিলেন। ঢাকায় থাকাকালীন 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন তিনি। কোলকাতায় ফিরে চালু করলেন নতুন বিজ্ঞান পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যেই ১৯৪৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'। অনেক উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী যুক্ত হলেন এর সাথে। এর লক্ষ্য ছিল একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ ঘটানো, তেমনি স্কুল কলেজে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক সরবরাহ করা। বহু ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্য দিয়েও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রসারের কাজ দৃঢ়তেতা সত্যেন্দ্রনাথ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

প্ল্যাঙ্ক বাজাতেন পিয়ানো, আইনস্টাইন বেহালা আর আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ বাজাতেন এসরাজ। সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। ঢাকা কিংবা কোলকাতায় অবসর সময়ে এসরাজ বাজাতেন তিনি। ছাত্র জীবনে কোলকাতায় ময়রা স্ট্রীটে পশুপতি ও গিরিজা ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ছিল সত্যেন্দ্রনাথের অবসরযাপনের প্রধান আশ্রয়। এই বাড়ীটির সাংস্কৃতিক

এরপর 6 পাতায়

রেজারেকশন (জৈব খাদ্য বৈচিত্র্য ফিরে পেতে একসঙ্গে পথ চলা)

উড়কি ধানের মুড়কি / বিন্নি ধানের খই ....

সেই কবেকার কোন ধূসর অতীত থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নাম না জানা, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ না পেরনো কৃষকেরা ধানের আদিম প্রজাতি থেকে নানান উদ্ভাবনী পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে, এক একটা করে বৈশিষ্ট্যকে সযত্নে বাছাই করে নতুন নতুন অজস্র জাতের ধান তৈরী করেছেন কখনও বৈচিত্রপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপযোগী করে তোলার জন্য আবার কখনো বা রসনার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে কিম্বা শুধুই নান্দনিক প্রেরণায়। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই,যার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ধান জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে, ১৯৬৫ সাল পর্যন্তও প্রায় পাঁচ হাজার প্রজাতির দেশীয় ধানের সন্ধান পাওয়া যেত। এর মধ্যে কোনও কোনও ধান জন্মাত সুন্দরবনের নোনা মাটিতে, কোনটা শুকনো খটখটে সেচবিহীন জমিতে, কোনটার শীষ ছিল আবার এতটাই উঁচুতে যে সহজেই দক্ষিণবঙ্গের জলা জমিগুলোতে ফলতে পারে। সুগন্ধি চালের মধ্যে ছিল গোবিন্দভোগ, তুলাইপাজি, কালোনুনিয়া, কালোভাত, রূপশাল, বাঁশকাঠি সুস্বাদু ভাতের জন্য কয়া, বকুলফুল, মধুমালতী, ঝিঙেশাল, চামরমনি অপরূপ খই তৈরী হত, কনকচুর, বিন্নি, ভাসামানিক বা লক্ষ্মীচূড়া ধান থেকে। মুড়ির জন্য রঘুশাল, লাল ঝুলুর, চন্দ্রকান্ত, মুর্গিবালাম আর পায়েসের ছোট দানার চাল হিসাবে তুলসী মঞ্জুরী, শ্যামা, তুলসীবকুল আর বৌপাগলি। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা এইসব দেশীয় ধান মানুষের, মাটির আর পরিবেশের সুস্বাস্থ্যের জন্য ছিল সহায়ক।

'বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল'

অবস্থাটা আমূল পাল্টে যেতে শুরু করল 'সবুজ বিপ্লবের' সূচনা থেকে, গত শতাব্দীর ষাটের দশক নাগাদ। বেশি উৎপাদনশীলতার লোভ দেখিয়ে তথাকথিত উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশকের যে ব্যবহার শুরু করা হলও, আজ তার পেছনে বহুজাতিক রাসায়নিক কোম্পানিগুলোর মুনাফা অর্জনের আসল উদ্দেশ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে, শুধু ভারতের নয় পৃথিবীর যেখানে যেখানে এটা লাগু করা হয়েছিল, সেখানেই। তেমনি স্পষ্ট হয়ে গেছে মানুষ আর পরিবেশের ওপর এই পদ্ধতিতে চাষের ভয়ংকর ক্ষতিকর প্রভাবগুলো। যত নিবিড়ভাবে সবুজ বিপ্লব কে গ্রহণ করা হয়েছে ততই চাষের খরচ তত বেড়েছে হুহু করে, ফসল বিক্রিয় করে ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছেন লক্ষ লক্ষ কৃষক, মাটিতে বিভিন্ন মাইক্রো এলিমেন্টের ঘাটতি আর জৈব উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে জমির উর্বরতা কমে গেছে মারাত্মাকভাবে, পাম্প দিয়ে ক্রমাগত জল তোলার ফলে মাটির নিচের জলস্তর নেমে গেছে সংকটজনক স্তরে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ফসলের চাষের পরিবর্তে একটা দুটো ফসলের চাষের প্রতি অতিরিক্ত ঝোক ফসলের ওপর ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের আক্রমণ বাড়িয়েছে, কীটনাশকের যথেচ্ছ, অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারে অনেক বন্ধু কিম্বা নিরীহ পোকাও পরিণত হয়েছে ক্ষতিকর পেস্ট-এ। রাসায়নিক সারের প্রয়োগ জমিতে আগাছার উপদ্রব-ও বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি যে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি শুধু থমকেই যায়নি, পাঞ্জাবের মত রাজ্যের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই তার নিম্নগতি আজ দিনের আলোর মতস্পষ্ট। এরই পাশাপাশি, অনেকটাই নীরবে, উচ্চফলনশীল ফসলের দাপটে বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশ আর জলবায়ুর উপযোগী, বৈচিত্রপূর্ণ রূপ-স্বাদ-সুগন্ধ যুক্ত, ভিটামিন মিনারেলস আর বিভিন্ন খাদ্যগুন সমৃদ্ধ দেশীয় ধানের অসংখ্য প্রজাতি হয়ত চিরতরেই হারিয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে আজ খুব বেশি হলেও ২০০ প্রজাতির বেশি ধান হয়না, তার মধ্যেও অনেকগুলো দ্রুত অবলুপ্তির পথে। একজন কৃষি বিজ্ঞানী এই ঘটনার তুলনা করেছেন বিপুল গণহত্যার সঙ্গে।

অন্যদিকে রাসায়নিকের সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ব্যবহারের ফলে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে কৃষক আর সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর। এ বিষয়ে আমাদের দেশে যে সামান্য গবেষণামূলক কাজ হয়েছে তাতেই খাদ্যশস্য, শাকসব্জি, পানীয় জল, মোষের দুধ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কীটনাশকের সন্ধান মিলেছে। পাঞ্জাবের ৪টি গ্রামের মানুষের রক্তের নমুনার মধ্যে ১৫ ধরণের বিভিন্ন কীটনাশককে সনাক্ত করা গেছে। পাঞ্জাব দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আর পিজিআই চন্ডিগড় এর এক যৌথ গবেষণায় জানা গেছে পাঞ্জাবের তুলো চাষের কেন্দ্র ভাটিন্ডায় রাসায়নিকের যথেচ্ছ ব্যহারের ক্যান্সারের প্রকোপ মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে। অবস্থাটা এতটাই খারাপ যে প্রতিদিন প্রায় ১০০ ক্যান্সার রুগী ওখান থেকে চিকিৎসার জন্য ট্রেনে করে রাজস্থানের বিকানীরের একটি ক্যান্সার কেন্দ্রে যান, স্থানীয় মানুষেরা ট্রেনটিকে 'ক্যান্সার ট্রেন' নামে ডাকেন। এসবের ফলেই সারা পৃথিবী জুড়ে বিত্তশালী মানুষেরা নিজেদের প্রয়োজনে বিষমুক্ত খাদ্যের স্বতন্ত্র আয়োজন করতে উদ্যত হয়েছে। ফলে নানান দেশে জৈব চাষের আবার কিছুটা হলেও প্রচলন বাড়ছে, কিন্তু খুবই সীমিত দায়রায়, মূল উদ্দেশ্যে তার প্রথম বিশ্বের বড়লোকদের খাবার প্লেটে রাসায়নিক বিষমুক্ত খাবার তুলে দেওয়া। সাধারণ মানুষের তা আয়ত্বের বাইরে। একইভাবে আজ যে তিন মডিফায়েড ক্রপ বা জিএম শস্যের বিপদ সম্পর্কে পৃথিবী জুড়েই অসংখ্য বিজ্ঞানী আর সচেতন মানুষ মুখর, সেই জিএম শস্য প্রথম বিশ্বের অনেক দেশেই নিষিদ্ধ হলেও ভারতে আবার নতুন করে কোম্পানিগুলোকে এর পরীক্ষা নিরীক্ষার ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে।

'কোথাও ভোরের বেলা রয়ে গেছে — তবে'

এইরকম নানা হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে বর্ধমানের আউশগ্রামে কিছু কৃষক এক আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে জিএম বীজ, পেট্রো-রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন। নলকূপ দিয়ে ভূগর্ভস্থ জল তুলে এনে চাষ করারও বিপক্ষে তারা। ইতিমধ্যেই তাঁরা হারিয়ে যেতে বসা পর্যাপ্ত খাদ্যগুন-সমৃদ্ধ দেশী ধানের অনেকগুলি বীজকে পুনরুদ্ধার করেছেন। শুধু চাল-ই নয়, খই-মুড়ি সহ নানা চালজাত খাবার এবং ডাল-সবজি সহ আরও অন্যান্য জৈব খাদ্যসম্ভার তাঁরা প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিতে চাইছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু গবেষক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সহ সাধারণ মানুষের এই সাহসী কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। 'রেজারেকশন' এই সমগ্র উদ্যোগটিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষিজাত খাদ্য সমাগ্রীর আউটলেট খোলার উদ্যোগ নিয়েছে। কোনও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়, কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি কৃষকরা যাতে উৎপাদিত পন্যের ন্যায্য দাম পান ও সাধারণ মানুষ যাতে বিষমুক্ত খাদ্য সামগ্রী ন্যায্যমূল্যে পেতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

চকোলেট ও রসায়ন

1 পাতার পর

চিনির দানা সদৃশ চকোলেট সহজ ব্রেকফাস্ট হিসাবে ব্যবহৃত হত। চকোলেটে উপস্থিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থটি হল থিওব্রোমিন। ৫০ গ্রামের একটি গাঢ় চকোলেট বারে প্রায় ২৫০ মিলিগ্রাম থিওব্রোমিন থাকে। থিওব্রোমিন যাকে রাসায়নিক দিক থেকে ক্যাফিন এর নিকটাত্মীয় বলা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র উদ্দিপককারী এই রাসায়নিকটির উপস্থিতির জন্যই রাত জাগার সময় সৈন্যদের কার্যকরী খাবারের তালিকায় চকলেটের ব্যবহার দীর্ঘদিনের। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকান সরকার তো চকোলেটকে Cacao হিসাবেই দেশের সেনাদের সরবরাহ করত।

তবে যে কোকোয়া গাছের (Theobroma) শুঁটি থেকে চকোলেটের প্রধান উপাদান কোকোয়া পাউডার তৈরী হয় সেই চিরহরিৎ গাছটি কিন্তু পাওয়া যায় প্রধানতঃ দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন নদী উপত্যকা ও কেন্দ্রীয় আমেরিকার ক্রান্তিয় অঞ্চলে। অতীতে এখানকার অধিবাসীদের কাছে এই কোকোয় এত মহার্ঘ বস্তু ছিল যে তারা বিনিময় মাধ্যম হিসাবে টাকা-পয়সার মতন এই কোকোয়া বীন্‌সও ব্যবহার করত। যদিও কোকোয়ার প্রাথমিক প্রাপ্তিস্থান আমেরিকা, তবে পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখন পৃথিবীর উৎপাদিত মোট কোকোয়ার তিন চতুর্থাংশ আসে প্রধানতঃ পশ্চিম আফ্রিকা এবং ব্রাজিল থেকে।

১৮২৮ সালে আমস্টারডামের ভ্যান হাউটন পরিবার আরও ভাল ও সুস্বাদু চকোলেট-পানীয় তৈরীর চেষ্টায় স্ক্রু- প্রেষ পদ্ধতির সাহায্যে কোকোয়া বীন্‌স গুলো পিষে কোকোয়া বাটার আলাদা করতে সমর্থ হন। সেই বাটার কোকোয়া পাউডারের সাথে মিশে যে মসৃণ নরম আঠালো পিন্ড তৈরী হলো দেখা গেল তা চিনি শোষণ করে নিতে পারে। এবার চকোলেট আর পানীয় রইলো না, পাওয়া গেল গাঢ় রঙিন কঠিন অথচ নরম সুস্বাদু চকোলেট।

রসজ্ঞদের মতে চকলেটের সঠিক স্বাদ পেতে হলে একে খালি পেটে খেতে হয়। তবে একেবারেই তাড়াহুড়ো করা যাবে না। প্রথমে মুখে পুড়ে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হবে এর প্রাথমিক সুবাস পাবার জন্য। তারপর বার কয়েক চিবিয়ে মুখের উপরের অংশে শেষ অবধি আটকে রাখতে হবে চকোলেটের পুরো আস্বাদ ও সুবাস পেতে হলে।

চকলেট স্নায়ু উদ্দিপককারী পদার্থ হিসাবে থিয়োব্রোমিন ও ক্যাফিন মোটামুটিভাবে ১০ঃ১ অনুপাতে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে চকোলেট খেলে যে ভাল লাগার অনুভূতি হয় তার পেছনে দায়ী এই থিয়োব্রোমিন ও ফিনাইলাইথাইল অ্যামিন নামক দুটি পদার্থ যা আসে কোকোয়া পাউডার থেকে। তবে আমাদের ক্ষেত্রে ভাল লাগার অনুভূতি জাগালেও কয়েকটি পোষ্য বিশেষ করে বিড়াল ও কুকুরের ক্ষেত্রে এই থিওব্রোমিনের প্রভাব কিন্তু মারাত্মক। পদার্থটির স্বল্প মাত্রাও এইসব পোষ্যদের ভীষণ রকম বমি ও ডায়ারিয়ার কারণ হতে পারে। এমনকি মাত্র ৫০ গ্রাম পরিমান ডার্ক চকলেটে থাকা থিওব্রোমিনই একটি ছোট কুকুরের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট বলে ধরা যেতে পারে।

ডার্ক চকলেটে কোকোয়া পাউডারের পরিমান সবচেয়ে বেশী (শতকরা ৩৫ ভাগের বেশী)। মিল্ক চকোলেটে এই পরিমান শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগের মধ্যে হলেও সাদা চকোলেটে কেবল কোকোয়া বাটার থাকে, যার উপাদান স্টিয়ারিক অ্যাসিড, প্যামিটিক অ্যাসিড, প্রভৃতি কতগুলো সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন ট্রাইগ্লিসারাইড। কোনও কোকোয়া পাউডার এতে ব্যবহৃত হয় না। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই চকোলেটকে আরো সুদৃশ্য ও মোলায়েম করার জন্য লেসিথিন নামক হলদে-বাদামী রঙের একরকম ফ্যাটজাত পদার্থ যোগ করা হয়। কখনও বা গাঢ় চকোলেটের উপর সাদা ছোপ দেখা যায়, যাকে চকোলেট ব্লুম বলে। এর কারণ আসলে দুর্বল সংরক্ষণের কারণে চকোলেটের মধ্যেকার শর্করা ও ফ্যাটের আলাদা হয়ে যাওয়া। তবে এই ঘটনার ফলে চকোলেটের খাদ্যগুন কিছু নষ্ট হয় না এবং তা নিরাপদে গ্রহণ করা যায়।

এবার দেখা যাক সুস্বাদু এই খাবারটি আমাদের স্বাস্থের পক্ষে ঠিক কতটা নিরাপদ। যদিও পরিমিতি পরিমান চকোলেট (বিশেষতঃ ডার্ক ভ্যারাইটি) আমাদের দেহের পক্ষে তেমমন ক্ষতিকর কিছু নয় তবে একে কিন্তু আবার পুষ্টিকর খাবারও বলা যায় না। ৩০ গ্রাম কঠিন চকোলেটে থাকে প্রায় ২ থেকে ৩ গ্রাম প্রোটিন ও শতকরা ৫৯ ভাগ শর্করা যা থেকে প্রায় ১৫০ ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। যদিও কোকোয়া বীন্‌স যথেষ্ট পরিমানে ভিটামিন বি এবং ভিটামিন ই সমৃদ্ধ, কিন্তু আধুনিক প্রক্রিয়াজাত চকোলেটে এই ভিটামিন প্রায় কিছুই থাকে না বললেই চলে। চকোলেট বেশী বা কম মিষ্টি যাই হোক এতে মোটামুটিভাবে ৪০ থেকে ৫৩ শতাংশ ফ্যাট বা কোকোয়া বাটার থাকে। তবে দুপ্রকার চকোলেটেই কোকোয়া পাউডার থেকে ক্রোমিয়াম, আয়রণ, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের মত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল পাওয়া গেলেও ফ্যাট ও অপরিমিত ক্যালোরির উপস্থিতির জন্য চকোলেট কিন্তু এইসব মৌলের উৎস হিসাবে একদম অনুপযুক্ত। তবে জরুরী প্রয়োজনের খাবার হিসাবে চকোলেট কিন্তু সত্যিই কার্যকরী। যদিও কোকোয়া পাউডারে যথেষ্ট মাত্রায় অক্সালেট থাকায় কিডনিতে স্টোন হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায়। বেশী মাত্রায় ফ্যাট এবং শর্করার উপস্থিতির জন্য দীর্ঘদিন থেকে চকোলেটকে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, মোটা হওয়া ও নানা রকম করোনারি আর্টারি ডিজিস (হৃদয় ঘটিত অসুখ) এর অন্যতম প্রধান শত্রু হিসাবে আমরা জেনে এসেছি। কিন্তু ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকান ডায়েটিক অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে বিজ্ঞানীরা চকলেটের কিছু উপকারী পদার্থের সন্ধান দিয়েছেন যা ডার্ক চকোলেটে প্রধানতঃ কোকোয়া পাউডার থেকে আসে। তারা চকোলেটে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাভোনয়েড (উদ্ভিদজাত বিশেষ ধরণের পলিফেনলীয় যৌগ যা মানুষের খাবারের তালিকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) এর সন্ধান পেয়েছেন যেগুলির রোগ প্রতিরোধকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ধর্ম রয়েছে। তাছাড়া ২০১৬ -র জুন মাসের মেডিক্যাল নিউজ টডে তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জোসেফ নডভিস্ট ও আধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে চকোলেটের অনেকগুলি সম্ভাব্য উপকারী দিকের কথা বলেছেন। দেহের কোলেস্টেরল মাত্রা কমানো থেকে শুরু করে হার্টের অসুখ, এমনকি স্বাভাবিক বৌদ্ধিক বিকাশেও নাকি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ডার্ক ভ্যারাইটির নানা রকম চকোলেট। কিন্তু আমেরিকান জার্নাল অফ কিনিক্যাল নিউট্রিশন এ প্রকাশিত এক গবেষণা অনুযায়ী আবার চকোলেট দেহের হাড়ের ঘনত্ব ও শক্তির হ্রাস ঘটায়।

তবে আধুনিক গবেষণা চকোলেটে উপস্থিত বিভিন্ন পদার্থের নানারকম উপকারী প্রভাবের সন্ধান দিয়ে থাকলেও আমাদের মত দেশের কারখানায় প্রক্রিয়াজাত খাবার হিসাবে উৎপন্ন চকোলেটের কার্যকরী গুনাগুন নিয়ে আমরা নিঃসন্দেহ থাকতে পারবো কি না এ প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়।

লেখক ঃ অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, মোঃ- ৯৪৩৪৩৭৭০৬৭

আমরা যা খাই

1 পাতার পর

গুনাবলী ঃ- পিচ্ছিল, রুচিকারক, ভেদক, স্নিগ্ধ, কোমল, বলকারক, পিত্ত ও কফ প্রশমক, মুত্রবর্ধক, বায়ুবর্ধক।

ঢ্যারশের রাসায়নিক সংযুতি ঃ- প্রতি ১০০ গ্রাম ঢ্যারশে কার্বোহাইড্রেট ৭.৩০ গ্রাম, প্রোটিন ২ গ্রাম, খাদ্য আঁশ ৩.২০ গ্রাম, মোট ফ্যাট ০.১ গ্রাম। ফোলেট তথা ফলিক অ্যাসিড ভিটামিন বি নাইন ৩৭ মিগ্রা, পটাশিয়াম ২৫৭ মিগ্রা, সোডিয়াম ৭.৮ মিদ্রা, ম্যাগনিসিয়াম ০.৯৯ মিগ্রা, ফসফরাস ৬৩ মিগ্রা, ম্যাঙ্গানিজ ০.৯৯ মিগ্রা, কপার ০.৯৪ মিগ্রা, লৌহ ০.৮ মিগ্রা, সিলোনিয়াম ০.৭ মিগ্রা, জিঙ্ক ০.৬০ মিগ্রা, ভিটামিন এ ৬৬০ আইইউ, ভিটামিন ৫৩ মিগ্রা, ভিটামিন সি ২১ মিগ্রা, যায়ামিন ২০০ মিগ্রা, বিবোকেভিন ০.৩৬০ মিগ্রা, নিয়াপিন ১ মিগ্রা, প্যানটোমেনিক অ্যাসিড ০.২৪৫ মিগ্রা, পাইরিভক্সিন ০.২১৫ মিগ্রা, বিটা ক্যারোটিন ২২৫ মিগ্রা। এতে কোলেস্টেরল নেই। শক্তি মেলে ৩৩ কিলোক্যালোরী।

কাঁচা ঢ্যারশ খেলে সমস্ত ভিটামিন 'সি' ই মেলে, সেদ্ধ করে খেলে পরিমান কমে যায়।

উপকারিতা ঃ- কচি ঢ্যাবশ কুচি সারা রাত ভেজানো জল হাপানির শুশ্রুষা করে। ধমনিতে বেয়ারা চর্বি জমতে দেয় না। চোখে ছানিপড়া আটকায়। বুন ফুস্ফুরির প্রদাহ দমন করে।

গর্ভাবস্থায় চতুর্থ থেকে দ্বাদশ সপ্তাহ পর্যন্ত বাড়তি ফোলিক অ্যাসিড দরকার হয়। তাই গর্ভবতীদের ঢ্যাবশ খেতে বলা হবে থাকে। কারণ ঢ্যাবশে ফোলেট থাকে।

ত্বককে তকতকে রাখার জন্য মিশরের রানী কিয়োপেট্রা ও চীনের রানী ইয়াং গুহ ফেই নিয়মিত ঢ্যাবশ খেতেন।

ঔষধার্থে প্রয়োগ ঃ-

অম্বলে - যারা অম্বলে ভোগেন তারা দুবেলা ঢ্যাবশ সেদ্ধ খান। সারা রাত ঢ্যাবশ কুচি ভিজিয়ে রাখা এক গ্লাস জল সকালে খালি পেটে খেলে উপকার পাবেন। আর বেশী উপকার পাবেন দুটি করে কচি ঢ্যাবশ দুবেলা চিবিয়ে খেলে। এতে কোষ্ঠবদ্ধতারও উপকার হয়।

আলসার ভুগছেন? ঢ্যাবশ খান। ১জন প্রনালীর উপর অস্থায়ী পরত তৈরী করে শুশ্রুষা করবে ঢ্যাবশ।

কাশিতে ঃ খুশখুশে কাশি হলে কাঁচা ঢ্যাবশ (বীজ বাদ দিয়ে) কুচি কুচি করে কেটে কড়া রোদে শুকিয়ে গুড়া করে ৫-৭ গ্রাম চিনি দিয়ে চিনির কড়া রসে মেড়ে বড়ীর মত করে কাচের শিশিতে রাখুন। রোগের প্রকোপ হলে যে কোন বয়সেরই হোন না কেন চুষে খান এক দিনেই আরাম।

দৌর্ব্বল্যে - যাঁরা খুব দুর্ব্বল অবসন্ন বোধ করেন। কাজে মন লাগে না। তাঁরা পরপর কয়েকদিন ঢ্যাবশ সেদ্ধ খেয়ে যান। সহজেই চনমনে হয়ে উঠবেন।

প্রস্রাবের উগ্রগন্ধে - কাঁচা ঢ্যাবশ (বীজ বাদে) ২৫-৩০ গ্রাম, ৪-৫ কাপ জলে সিদ্ধ করে দেড় দু' কাপ থাকতে নামিয়ে চটকে ছেঁকে সে পিচ্ছিল জলটি খেলে প্রস্রাব সরল হবে পরিমানে বাড়বে আর গন্ধের তীব্রতা কমবে। জলটি একবারে না খেয়ে সারা দিনে ৩-৪ বারে খেলেও হবে।

প্রস্রাবের স্বল্পতায় বেশী জল খাওয়া সত্ত্বেও প্রস্রাব কম, এক্ষেত্রে ২০-২৫ গ্রাম কাঁচা ঢ্যাবশ ৪-৫ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ঐ পিচ্ছিল জলটি দিনে ২-১ বার খেলেই প্রস্রাব স্বাভাবিক হয়ে আসে।

ব্লাড সুগারে / ডায়াবেটিসে - রক্তে শর্করার আধিক্য থাকলে কালোজাম বীজচূর্ণ ও ৩-৪টি কচি ঢ্যারশ সিদ্ধ জলের সঙ্গে প্রত্যহ কিছুদিন খেলে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

লেখক ঃ প্রনবেশ কুমার চৌধুরী, চলভাষ - ৯৯৩২৮৯১৯০৪

জাতীয় অধ্যাপক

3 পাতার পর

পরিমন্ডল সত্যেন্দ্রনাথের মনে সঙ্গীত সম্পর্কে প্রাথমিক ভালোবাসা গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের আসি বছর সম্পূর্ণ করেন। একই সাথে ১৯২৪ সালে তাঁর আবিষ্কৃত বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়। সেই উপলক্ষে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৪ সালে জানুয়ারি মাসে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজিত করে। পৃথিবীর বহু গুনী বিজ্ঞানীদের মাঝে উপস্থিত হয়ে অসুস্থ সত্যেন্দ্রনাথ বলেন ' অনেক বছর সংগ্রামের পরে জীবনের প্রান্তে এসে যদি কেউ দেখে যে তার কাজ বহু প্রসংসিত হয়েছে তবে তার মনে হয় যে আর দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অসীম কর্মকান্ড দিয়ে তৈরী করে গেলেন এক যোগসূত্র, যার একদিকে প্রাচীন কোয়ান্টম তত্ত্ব নিয়ে রয়ে গেলেন প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, বোর প্রমুখরা; আর অপরদিকে নব্যকোয়ান্টম তত্ত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শোরডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ, ডিরাক প্রমুখ বিজ্ঞানীরদল। পদার্থবিদ্যার পরবর্তী ইতিহাস রচিত হল দরিদ্র ভারতবর্ষের এই উপস্থিত আত্মভোলা বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ম মস্তিষ্কের ধূসর কোষের ছত্রছায়ায়। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সংখ্যাতত্ত্বের একটি সমস্যা টেবিলের উপর অসমাপ্ত রেখে এই মহান বিজ্ঞানী পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুর ৪০ বছর পরে এই মানুষটি সম্পর্কে লিখতে বসে বিস্ময় জাগে। মাত্র ৩০ বছর বয়সে বিশ্বের বিজ্ঞান দরবারের প্রথমসারিতে স্থান করে নিলেন যে মানুষটি পরবর্তী ৫০ বছরে তার যথাযথ ক্রমবিকাশ হল কই? সে উদ্যম জীবনের প্রথম পর্যায়ে তার কাছে আমরা পাই তা যেন কিছুটা থিতিয়ে গেল কোলকাতা থেকে দূরে ঢাকার নিস্তরঙ্গ জীবনযাপনে। পুনরায় কোলকাতায় ফেরার পরে আলোড়ন হল, তাই একদিক থেকে ঢাকার বিচ্ছিন্ন জীবনে বাঙালী বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান চর্চায় কী লোকসান ডেকে আনল। আবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাবলে মনে হয় নবনব গবেষণা, গবেষণাপত্র প্রকাশ, তার প্রচার - বিজ্ঞানের এই রুটিন কর্মপদ্ধতির মধ্যে তো আটকে থাকে একজন আত্মপ্রচারে মগ্ন মানুষ। সত্যেন্দ্রনাথ এই ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে উঠে অনেক উদার দৃষ্টিতে বড় করে জীবনকে দেখতে শিখেছিলেন। তাই সারা জীবনে প্রকাশ পেয়েছে মাত্র ২৫টি গবেষণাপত্র। পরিবর্তে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের কাছে। নিজের গবেষণার বদলে সময় দিয়েছেন অন্যের সমস্যা নিরসনে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাই একজন বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী নন বরং একজন মনের মানুষ রূপে তিনি রয়ে যাবেন বাঙালীর হৃদয়ে।

লেখক ঃ রাজদীপ ভট্টাচার্য্য, মোঃ- ৯৮৩৬৫৬৯৮৫০

লিমেরিক

যেখানে যে বই আছে পাখি সম্বন্ধে মন দিয়ে পড়ি সব সক্কাল-সন্ধে
আজ শেষ হবে পড়া, আর বই বাকি নেই আপশোশ শুধু - এই তল্লাটে
পাখি নেই। — এডোয়ার্ড লিয়ার। অনুবাদ ঃ সত্যজিৎ রায়।

প্রাণী চিকিৎসা গবেষণার পথিকৃৎ কতিপয় বাঙালী বিজ্ঞান

ভারতবর্ষে প্রাণী পালনের প্রচলন হয় সভ্যতার আদিকালে, খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ থেকে ৮০০০ এই সময়কালে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয় মানুষ ও প্রাণীর সভ্যতার পরিচয় মেলে পুরাতাত্ত্বিক নানা নিদর্শনের মধ্যে দিয়ে। প্রাণী পালন যে একটি সহজাত প্রবৃত্তি ছিল তার বহু প্রমাণ মিলেছে বিভিন্ন সূত্র থেকে। তখন গবাদি প্রাণী ছাড়াও ঘোড়া, কুকুর, হাতি, পাখী (মুরগী ও অন্যান্য) পোষার রেওয়াজ ছিল। দেহ থাকলেই অসুখ-বিসুখ থাকবে; আর রোগবালাই থাকলে তার উপশমে চিকিৎসার প্রকরণও থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা ব্যবস্থা তখনও চালু ছিল না কিন্তু অভিজ্ঞতা ও বিশেষ পারদর্শিতার গুনে নিশ্চয়ই কেউ কেউ প্রাণী চিকিৎসার কাজ করতেন। তাঁদের নাম আমরা কেউ না জানলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না গাছ গাছড়া ও জড়ি-বুটির সাহায্যে তাঁরা সেই সময় না জানি কত দূরারোগ্য ব্যধির উপশম করতেন।

এই সময়কালের বেশ কিছুটা পরে প্রাক্- বৈদিক যুগে (খ্রীঃ পূঃ ২৩৫০) প্রথম প্রাণী চিকিৎসক হিসাবে যিনি স্বীকৃত, তাঁর নাম শালিহোত্রা। ইনি ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার ও উপকার বিষয়ে অসাধারণ তথ্য রেখে গেছেন, প্রাণী শল্য চিকিৎসায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। সাইনাস, ফিশচুলা, হাড় ভাঙ্গা, লিগামেন্ট ও টেন্ডনের মেরামতিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গরুর বাচ্চা প্রসবের সময়ের সমস্যা (ডিসটোকিয়া)-র সমাধান এমনকি জোড়া চামড়ার পরিবর্তে স্বাভাবিক চামড়া প্রতিস্থাপনও তিনি করে গেছেন। এরপর বৈদিক যুগের মাঝামাঝি (খ্রীঃ পূঃ ১০০০) আমরা আর এক প্রাণী চিকিৎসকের বিষয়ে জানতে পেরেছি। তিনি হচ্ছেন হস্তি চিকিৎসা বিশারদ পলকপ্য। তাঁর লেখা গজ আয়ুর্বেদ বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল। এই বই এ তিনি হাতির চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধ তি বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তীকালে মানুষের চিকিৎসার সাথে সাথে প্রাণী চিকিৎসা শাস্ত্রেও বিশেষ অবদান রেখে গেছেন চরক ও শ্রুশ্রুত (খ্রীঃ পূঃ ৬০০)।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে (খ্রীঃ পূঃ ৩৩২-৩২২) প্রাণী পালন ব্যবস্থা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে এর কিছু পরে প্রাণী চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় অশোকের রাজত্বকালে। (খ্রীঃ পূঃ ৩০০) এই সময়ে প্রাণী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গড়ে ওঠে। হাসপাতালে অন্তঃবিভাগ ও বহিঃ বিভাগ রোগী (প্রাণী) র চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল।

এরপরের সময়কালে ভারতবর্ষে প্রাণী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস ততটা স্পষ্ট নয়। মোঘল সাম্রাজ্যের সময়কালে প্রাণী পালন বেশ উন্নত হলেও কোনও বিশিষ্ট প্রাণী চিকিৎসকের নাম আমরা সেভাবে জানতে পারিনি। তবে যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হাতি ও ঘোড়ার চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞদের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল, তা অনুমান করাই যায়। শেরশাহ-র সময়ে কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার দুধারে পথচারীদের জন্য তৈরী নানা ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র ও কেশ নিবারন কেন্দ্র তৈরী করা হয়েছিল। হয়ত সেগুলি ছিল আজকের পশু কেশ নিবারণ সমিতি নির্মাণের অনুপ্রেরণা।

আধুনিক প্রাণী চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা ও ব্যপ্তি ঘটেছিল অবশ্যই ইউরোপে। গবাদি প্রাণীর প্লেগ (ক্যাটেল প্লেগ) বা রিন্ডারপেষ্ট অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ছিল ভয়াবহ এক আতঙ্কের কারণ। চরম অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে প্রয়োজন ছিল এক বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার। ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে গড়ে উঠেছিল ভেটেরিনারী কলেজ। এ ব্যাপারে ক্যাটেল প্লেগ কমিশন (১৮৭১) এর সুপারিশের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

১৮৮৩ সালে তৎকালিন বাংলার ব্রিটিশ সরকার বাংলায় একটি প্রাণী চিকিৎসা বিজ্ঞান সংস্থান (ভেটেরিনারী ইনস্টি টিউশন) তৈরীর জন্য একটি কমিটি গড়ে। ঐ কমিটি ১৮৮৩ এবং পরবর্তীতে ১৮৮৬ সালে একটি সংস্থান নির্মান করার প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবটি তৎকালীন বাংলার জমিপঞ্জীকরণ ও কৃবি বিভাগের নির্দেশক শ্রী এম ফিনুকেন -এর নজরে আসে। তিনি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন। ঐ সময়ে তিনি খবর পান কলকাতার অদূরে সোদপুরে কলকাতার কিছু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী প্রায় ১৩০০ গবাদি পশুর একটি আস্তানা 'পিঞ্জরাপোল' গড়ে তুলেছে। ঐ অঞ্চলে একটি ভেটেরিনারী ইন্সটিটিউশন গড়ার প্রস্তাবনায় পিঞ্জরাপোল কমিটি সায় দেয় ও ভবন নির্মাণের ব্যয় বাবদ ৩০ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত হয়। 'ক্যাটেল প্লেগ কমিশন' এর অন্যতম সদস্য ডাঃ কেনেথ ম্যাকলিওড ও শ্রীফিনুকেন ১৮৯০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী পিঞ্জরাপোল পরিদর্শণ করেন। সিদ্ধান্ত হয় ইন্সটিটিউশন তৈরীর কাজ তাড়াতাড়ি শুরু করা হবে। এই সময়ে ভবন গড়ার স্থান নির্বাচন নিয়ে নানা প্রকার নাম উঠে আসে। সোদপুর ছাড়াও এন্টালি, শিবপুর, ভাগলপুর, বেলগাছিয়ার কথা আলোচিত হয় শেষ পর্যন্ত বেলগাছিয়ার নামই ভবন নির্মাণের স্থান হিসাবে চূড়ান্ত হয়। পিঞ্জরাপোল কমিটির সভাপতি রাজা সিভ বক্স বগ্‌লা বাহাদুর ঐ এলাকার সাড়ে তিন বিঘা জমি ও ভবন নির্মাণের জন্য ৩০ হাজার টাকা দান করেন। তৎকালীন বাংলার সরকার ১৮৯০ সালে ৪৩৮৯ টাকার বিনিময়ে আরও ৫ বিঘা ২ কাঠা জমি অধিগ্রহন করে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক স্যার দিনশ ম্যানেকজী পেটিট প্রাণী হাসপাতাল বানানোর জন্য ২৫ হাজার টাকা দান করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৯২ সালের ২০শে এপ্রিল তৎকালীন গর্ভনর জেনারেল স্যার চার্লস ইলিয়ট ইন্সটিটিউশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ডাঃ কেনেথ ম্যাকলিওড এর নামাঙ্কিত ভেটেরিনারী স্কুল ও স্যার পেটিট এর নামাঙ্কিত প্রাণী হাসপাতাল চালু হয় ১৮৯৪ সালের ১০ই জানুয়ারী। ১৮৯৬ সালে ভেটেরিনারী স্কুলটি কলেজের মর্যাদা পায় এবং বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজ ও হাসপাতাল নামে চিহ্নিত হয়। বাংলার প্রাণী চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত যাবতীয় পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজ বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। অধিকাংশ বাঙালী প্রাণী চিকিৎসকই এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র, ডায়গ্নস্টিক ল্যাবরেটরী ও কলেজের বিভাগীয় গবেষণাগারে যে সমস্ত কাজে রত ছিলেন তা রাজ্যের প্রাণী চিকিৎসা ও সামগ্রিক প্রাণী সম্পদ তৈরীতে ভীষণ ভাবে কাজে লেগেছে। রাজ্যের বাইরে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্তরের বহু বাঙালী প্রাণী চিকিৎসক বিগত দিনে গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁদের অবদান আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত। বেশ কিছু কাজ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

লেখক ঃ অধ্যাপক সিদ্ধার্থ নারায়ন জোয়ান্দার ও অসীম কুমার ভট্টাচার্য্য

পদ্মার পারে ফুকুশিমা হলে গঙ্গার পারের মানুষ বাঁচবে তো ?

যারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করেন তাদের Environmentalist বা Environment Activist বলা হয় কিন্তু Nuclear Power বা Nuclear Weapon এর বিরুদ্ধে বলেন তাঁদের Anti Nuclear Activist বলা হয়। আসলে প্রথম থেকেই এই Energy কে Safe বলা শুরু করেন কিছু রাষ্ট্রনায়ক ও তাদের বিজ্ঞানীকুল। তাই Nuclear Power / Weapon বিরোধিতা যারা করেছেন তাদেরকে Anti করেই Anti Nuclear Activist নাম দেওয়া হয়েছে। তাতে মেঘনাদ সাহা প্রফুল্ল কিদোয়াই, সুজয় বসু, প্রদীপ দত্ত এরা থাকতেই পারেন। পৃথিবীতে আজ প্রমাণিত Nuclear Power কোনও Power (বিদ্যুৎ হিসেবে) নয় এবং তা সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে এই চিন্তা থেকেও Power Plant তৈরি করা হয় না এবং এই Power Plant ফলে দেশের যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে ফ্রান্স তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। বাংলাদেশের রামপাল এ N.T.P.C. একটা Thermal Power Station করছে ১৩২০ মেগাওয়াটের। এর ফলে সুন্দরবনে Acid Rain হতে পারে, সেজন্যে বাংলাদেশে একটা আন্দোলন চলছে। তা সত্ত্বেও সেটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সাধারণ মানুষ পথে নেমেছে পশ্চিমবঙ্গের বহু পরিবেশবিদ্ এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র যাতে অন্যত্র হয় তার জন্য আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

কিন্তু নীরবে যে কান্ড বাংলাদেশের পাবনার ঈশ্বরডিহিতে ঘটে চলেছে স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই তার খবর কমই রাখেন দুই বাংলার মানুষেরা। ১৯৬১ সালে প্রথম বাংলাদেশে Atomic Energy Commission গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে 'Triga' Research Reactor Atomic Energy Research Establishment in Savar, Near Dhaka থেকে পরিকল্পনা শুরু হয়। ২০০১ সালে বাংলাদেশে Nuclear Power Plant তৈরি করে এবং ২০০৭ সালে ২৪ জুন সরকারিভাবে ঘোষণা করে যে বাংলাদেশে Nuclear Power Plant তৈরি হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নিশ্চয়ই মনে আছে ঠিক এই সময়েই পূর্ব মেদিনীপুরে হরিপুরে Rostom রাশিয়ার এই কোম্পানি পরমাণু চুল্লি বসানোর জন্য ভারত সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই চুল্লি যাতে তৈরি না হয় তার জন্য বঙ্গোপসাগরের পাশের বসবাসকারী মানুষেরা ভিটে মাটি বাঁচাও পরমাণু চুল্লি বিরোধী একটি সংগঠন তৈরি করে পথ আটকে দেয় সরকারি শক্তি কমিশনের মানুষদের। সঙ্গে যোগ দেন বিভিন্ন পরমাণু বিরোধী বিজ্ঞানীগণ গণসংগঠন ও বিজ্ঞান সংগঠন। বন্ধ হয়ে যায় এই প্রকল্প।

কিন্তু রাশিয়াকে তার চুল্লি বিক্রি করতে হবে। Rostom খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে ১৯৬১ সাল থেকে পদ্মার পারে ঈশ্বরডিহিতে (পাবনা জেলায়) ২৫৩.৯০ একর জমি পরমাণু চুল্লি বসানোর জন্য সরকার মজুত রেখেছে। মে ২০১০ রাশিয়ার সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের কথা হয় যে ঈশ্বরডিহিতে রূপপুরে এই ২০০০ মেগাওয়াটের একটি পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হবে। ২টি রি-অ্যাক্টরের মধ্য দিয়ে এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। প্রতিটি ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করবে। এর জন্য বাংলাদেশের মত একটি গরিব রাষ্ট্রকে খরচ করতে হবে USS-13 বিলিয়ন। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই প্রকল্পের উৎপাদন শুরু হবে ২০২১ সালে। এই প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২ নভেম্বর, ২০১১ সালে।

আসলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে সারা পৃথিবীতে যা হচ্ছে তার শিকার হতে চলেছে পৃথিবী সেরা জীব বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। সারা পৃথিবীতে পরমাণু চুল্লি কারবারিরা এত শক্তিশালী তাঁরা সব সময়েই পরমাণু বিদ্যুৎ অন্য সব বিদ্যুৎ এর থেকে সেরা এবং নিরাপদ তা প্রমাণ করতে মরিয়া। বাংলাদেশে SEZ চালু আছে EPZ নামে। সেখানে বাংলাদেশের নূন্যতম মজুরি থেকে কম মজুরিতে কাজ করে মানুষ। তাই সেই সব মানুষের দেশে যদি ফুকুশিমার মত কোনও ঘটনা ঘটে তবে আপত্তি কি ? এছাড়া প্যারিস সম্মেলনের পর কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে পৃথিবীর যে কটি দেশের সমুদ্রের পাড়গুলো ডুবে যাবে তার মধ্যে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড অন্যতম। আর রূপপুরে যে পরমাণু চুল্লি তৈরি হচ্ছে তা একদম পদ্মার পারে। চুল্লির বর্জ্য জুলে নির্গমনও হবে পদ্মায়। পশ্চিমবঙ্গে রেডিও অ্যাকটিভ ইলিশ মাছ দিয়ে কলকাতায় হবে ইলিশ-উৎসব।

আর ফুকুশিমার মত জলোচ্ছাস যদি রূপপুরে ঘটে তবে গঙ্গার পারের মানুষেরা কেমন থাকবেন ভাববার সময় এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের হরিপুর থেকে রাশিয়ার চুল্লি বিক্রেতাদের বিতারিত করলে ওরা ২০০৭ সালেই বাংলাদেশের সঙ্গে ঐ চুক্তি সারে। 2.4GWE নিউকিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে ঈশ্বরডিহির রূপপুরে। করছে Russian Rosatom State Atomic Energy Corporation। এই প্রজেক্টের Operation শুরু হবে ২০২৩ সাল থেকে । কিন্তু অদ্ভুত বিষয় ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি দূষণের ছাড়পত্র পায়নি। এছাড়া এই পরমাণু বর্জ্য বাংলাদেশের কোথায় ফেলা হবে তার পরিকল্পনা রূপায়ন করতে পারেনি। Russian Rosatom State Atomic Energy Corporation ঢাকা থেকে ২০০ কিমি দূরে পাবনা জেলা আর তার পাশেই ঈশ্বরডিহি উপজেলা। সবুজের সমারোহে নির্মল পানীয় জল এখনও বর্তমান। সব বিষিয়ে যাবে এই Nuclear Power Plant হলে। Transparency International বাংলাদেশের একটি সামাজিক সংগঠন, ওরা এর বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এবার গঙ্গার পারের মানুষদের বোঝানোর পালা পদ্মা যদি দূষিত হয় গঙ্গার অবস্থাও শোচনীয় হবে।

লেখক ঃ বিবর্তন ভট্টাচার্য্য, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা।

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)
E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in
bijnandarbar1980@gmail.com